ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম : দার্শনিক পরিকাঠামো

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

[স্বনামধন্য পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁর জীবৎকালে তাঁর সঙ্গে নিবোধত-র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এ-পত্রিকায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বহুবার লেখা দিয়েছেন তিনি। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে তাঁর দেওয়া 'Sri Ramakrishna's Religion' নামে ইংরেজি বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। প্রখ্যাত মনীষীর মননঋদ্ধ বক্তৃতাগুলির অনুবাদ প্রকাশে আমরা ব্রতী হয়েছি। এবারের প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন **সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত**।]

এই অধ্যায়ে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবনা উপলব্ধি করার সঠিক পন্থা নির্ধারণের বিষয়টি আলোচনা করব। কোনও একটি ধর্মদর্শন উপস্থাপনা করার কথা তিনি নিশ্চয়ই ভাবেননি। কোনও ধর্মসম্প্রদায় গঠন বা দার্শনিক মতবাদের প্রচার ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। নির্দিষ্ট কোনও অধ্যাত্মদর্শন গঠন করার অভিপ্রায় তাঁর ভাবনায় ছিল না। বস্তুত বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ বিশ্বের অন্যান্য সকল মহান ধর্মাচার্য সম্বন্ধেই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। তা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচর্যা ও তাঁর শিক্ষার সম্ভাব্য দার্শনিক পরিকাঠামোটি জানতে আমরা ইচ্ছুক। আমাদের সামনে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীর বিপুল সম্ভার এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই এই উপদেশাবলি সংকলিত হয়ে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা আরম্ভ হয়। ২৪ জানুয়ারি ১৮৭৮ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) সর্বপ্রথম 'পরমহংসের উক্তি' শিরোনামে তাঁর কিছুসংখ্যক উপদেশ প্রকাশ করেন। যাঁরা এই উপদেশগুলি শুনেছিলেন তাঁদের সামনে এগুলি একইসঙ্গে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং শিক্ষণীয়রূপে প্রতিভাত হয়েছিল।

'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১৮৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি লেখা হয়েছিল, ''তিনি যেসকল কথা বলিয়াছেন তাহা অতি সারবান ও শিক্ষাপ্রদ।'' এই পত্রিকাতেই ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের তেরোটি উপদেশ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত এই প্রথম একটি পত্রিকায় তাঁর বাণী মুদ্রিত হল। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশকেই বাঙালি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার অভিনবত্ব আবিষ্কার করে।

যথাক্রমে ১৮৯৭ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কৃত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলির

ইংরেজি অনুবাদ-সম্বলিত দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি পাঠ করে স্বামী বিবেকানন্দ মহেন্দ্রনাথকে ২৪ নভেম্বর ১৮৯৭ একটি পত্রে লিখেছিলেন, ''আমাদের গুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক।'' এর এক বছর পর ম্যাক্সমুলার 'শ্রীরামকৃষ্ণ : তাঁর জীবন ও বাণী' শীর্ষক একটি বই লেখেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের তিনশো পঁচানব্বইটি উপদেশ সন্নিবেশিত হয়েছিল। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবনার দার্শনিক ভিত্তির সন্ধান সম্ভবত ম্যাক্সমুলারই সর্বপ্রথম করেছিলেন। বেদান্তদর্শনে তিনি তার খোঁজ পান। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মকে কেবলমাত্র বেদান্তভিত্তিক বলে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। ইতিপূর্বেই আমি প্রতাপচন্দ্রের সেই মন্তব্যের উল্লেখ করেছি যেখানে তিনি বলেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের সুবিশাল এবং সর্বব্যাপী মনের পরিমাপ কোনও একটিমাত্র নির্দিষ্ট দর্শনশাস্ত্রের নিরিখে করা সম্ভব নয়।

পাঁচটি খণ্ডে যথাক্রমে—১৯০২, ১৯০৪, ১৯১০, ১৯২৫ ও ১৯৩২ সালে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মনের বিশাল ব্যাপ্তির পরিচয় পাই, তাঁর মনের বহু বিচিত্র ভাবের খেলা প্রত্যক্ষ করি। আমরা তাঁকে দেখি এক বাঙ্ময় পুরুষরূপে—তাঁর বাণী শ্রবণ করি; তাঁর নীরবতার, তাঁর হাসির, অশ্রুজলের, ভাবসমাধির, নৃত্যগীতেরও সাক্ষী হই। বস্তুত বাংলা ধর্মগ্রন্থরূপে পরিগণিত 'কথামৃত' পাঠ করে আমরা অনুভব করি তাঁর হৃদয় বিশাল, অপরিমেয়। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'ও এমনই ধারণার পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তার মধ্যে একটি অক্ষয়কুমার সেন রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'। ১৮৯৪ ও ১৯০১ সালের মধ্যে প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বই পদ্যাকারে রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের বিস্তারিত জীবন-আলেখ্য। এর সঙ্গে অবশ্য সংযোজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আলোচনা ও মন্তব্যসমূহ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দের 'হিন্দুধর্ম কী' শীর্ষক প্রবন্ধ, যার প্রথম প্রকাশকাল ১৮৯৭ সাল এবং পরে যা তাঁর বাংলায় লিখিত 'ভাববার কথা'য় সংযোজিত হয়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ম্যাক্সমুলারের শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর বিবেকানন্দকৃত সমালোচনা গ্রন্থ। এটি প্রথমে উদ্বোধনে প্রকাশিত ও পরে 'ভাববার কথা'-য় সংযোজিত হয়। আর একটি অপরিহার্য আকর রচনা স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'মদীয় আচার্যদেব' (My Master)। পরিশেষে আমি উল্লেখ করব তাঁর ত্যাগী ও গৃহী সন্তানদের লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণা, এগুলির ইংরেজি অনুবাদ 'Ramakrishna as We Saw Him' শিরোনামে স্বামী চেতনানন্দ প্রকাশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন করতে হলে উপরিউক্ত বইগুলির পঠন অপরিহার্য।

এগুলির উপর ভিত্তি করে আমরা 'শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম' বলতে ঠিক কী বুঝি, তার ধারণা করা সম্ভব। বাস্তবিকই খ্রিস্ট অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক বেশি উপাদান সংগ্রহ করা যায়। তবে ওই বিষয়ে জানতে হলে প্রথমে আমাদের ধারণা করতে হবে, কোনও ব্যক্তির ধর্ম বলতে আমরা কী বুঝি। আমাদের মধ্যে যাঁরা নাস্তিক নন, তাঁরা সংখ্যায় কম, তাঁদের জীবনে একটি ধর্মীয় দিক আছে। জন্মসূত্রে যাঁরা হিন্দু তাঁদের অধিকাংশই এই ধর্মের ঐতিহ্যের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা পোষণ করেন, অনেকে হয়তো সোচ্চারে তা প্রকাশ করেন না। এঁরা মন্দিরে দেবদর্শনে যান, তীর্থযাত্রা করেন, বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করেন, কখনও কখনও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন এবং ধর্ম-নির্ধারিত কিছু নৈতিক নিয়ম মেনে চলেন। খ্রিস্টান পেলেজিয়ানদের মতো

'আদিম পাপ' ধারণায় বিশ্বাসী না হলেও তাঁদের মনে 'পুণ্য' এবং সেই অনুষঙ্গে 'পাপের' বোধ আছে। এই ধরনের মানুষের ধর্মাচরণে লক্ষ করা যায় গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা অনুভূতির প্রগাঢ়তার অভাব, উদ্বুদ্ধ চেতনা-সঞ্জাত উদ্দীপনার অভাব। পরম আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের জন্য এই প্রগাঢ় অনুভূতি অপরিহার্য। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার গভীরতা থেকেই জন্ম নেয় ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা এবং সূচনা করে সেই অনুভূতির— প্লটিনাস যাকে বলেছেন 'এককের একক অভিমুখে যাত্রা'। এককথায় আমাদের জীবনচর্যায় ধর্ম আছে, নেই সেই গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি যার প্রেরণায় 'অণুচৈতন্য' সন্ধান করে 'বিভুচৈতন্যে'র। আধ্যাত্মিক পরম আনন্দানুভূতির প্রেরণায় আমরা উপলব্ধি করি আমাদের যেমন প্রয়োজন ঈশ্বরলাভ, তেমনই ঈশ্বরের প্রয়োজন 'আমাদের'। এই উপলব্ধি থেকেই কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয় : ''আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।'' এই সুগভীর আধ্যাত্মিকতাই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম।

আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে যে-ঐশী আনন্দ জাগ্রত হত সে-পরমানন্দ সম্বন্ধে শুধুমাত্র ধারণাই যথেষ্ট নয়। এই ঐশ্বরিক আনন্দের দার্শনিক উৎসও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। একথা ঠিক যে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং কোনও দার্শনিক তত্ত্বকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর স্বতোলব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করে কোনও তত্ত্বালোচনাও করেননি। তবুও আমরা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানকে একটি সুস্পষ্ট চিন্তাধারায় উপস্থাপন করতে আগ্রহী।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বজ্ঞাপ্রসূত দর্শন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রধান কারণ, ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যে মানুষ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রচলিত বহুসংখ্যক দার্শনিক মতবাদ; জগৎ সত্য কি না তার উত্তরও এইসকল মতবাদনির্ভর। তিনহাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের ঐতিহ্য জন্ম দিয়েছে পরস্পরবিরোধী অসংখ্য সম্প্রদায় ও দার্শনিক মতবাদের। এদের মতভেদের ফলে প্রায়শই আমরা এত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হই যে, আপাতদৃষ্টিতে এদের সমাধান-অযোগ্য বলেই মনে হয়। এইসব সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আমরা বুঝতে চাই, এইসব পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার মধ্যে কোনও স্থির জ্ঞানের আলোকে আমাদের সমগ্র জীবনকে উদ্ভাসিত করতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ সক্ষম কি না। আমরা জানতে চাই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম সর্বজনীন সত্যের প্রতিভূ কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কীভাবে একজন ফরাসি রোমান ক্যাথলিককে প্রভাবিত করেছিল সেদিকে আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। রোম্যাঁ রোল্যাঁ এই জীবনকে 'নতুন শরৎকাল' বলে অভিহিত করেছেন। এই নতুনত্ব সম্বন্ধে জানতেও আমরা উৎসুক।

অগণিত মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে থাকত। স্পষ্টতই তাঁর অধ্যাত্মজীবনের অভিনব বৈশিষ্ট্যই তাদের আকর্ষণ করত। আমাদের আশে পাশে বহু গেরুয়াধারী বা স্বল্পবাস সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখি। তাঁরা বৃক্ষতলে বা পর্বতগুহায় বাস করেন, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করেন। কখনও তাঁরা পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন, কখনও প্রস্তরাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের শিষ্যও আছেন। কিন্তু তাঁরা কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত নন। শ্রীরামকৃষ্ণ গেরুয়া ধারণ করেননি। সংসারে বাস করেও তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতেন। যেকোনও গৃহীর মতো তিনি রান্না করা খাদ্য গ্রহণ করতেন, তামাক সেবন উপভোগ করতেন, রসিকতা করতেন এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর কাছে আগত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে তাঁর কোমল ও দরদি ব্যবহারে মোহিত হত। তাদের মনে হত যে

তাঁদের গুরু তাঁদেরই একজন হয়ে থাকতে চান।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও কোনও ধর্মীয় তত্ত্ব উপস্থাপন করেননি বা তাঁর উপস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। তবে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং অনেক খ্যাতনামা দার্শনিক যেসব তত্ত্ব উত্থাপন করেছেন তার সমাধানও করেছেন। কিন্তু তিনি এত সরল ছিলেন যে কখনও কোনও বিতর্কে জড়াতেন না। তার্কিক স্বভাবের মানুষও তিনি ছিলেন না। তবে তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিকে কখনও এমন কোনও প্রশ্ন করে বিচলিত করা যায় না যার উত্তর নেই। কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতিই সব বিবাদ-বিসংবাদ স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। ধর্মবিষয়ে কোনও তর্ক তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর আলাপচারিতায় অস্তি-নাস্তিমূলক কথাবার্তা অপেক্ষা ভক্তিমূলক গানই বেশি থাকত। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা না করে তিনি গল্পের মাধ্যমে উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, ''বাগানে আম খেতে এসেছি; কত গাছ, কত ডাল, কত কোটি পাতা—এসব বসে বসে হিসাব করবার আমার কি দরকার!'' শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর সামনে বসে থাকলে মনে কোনও প্রশ্নের উদয় হত না। ধর্মকে মনে হত এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সেই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার গভীরতা মন থেকে সব তর্ককে দূরে সরিয়ে দিত।

এসব সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি-প্রসূত আধ্যাত্মিকতা এবং বাণীর তাৎপর্য ও মূল্য দার্শনিক পরিভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব। স্বজ্ঞা ও যুক্তির সম্বন্ধকে ভিত্তি করেই আমি সেই দর্শনকে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হব। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে : সহজাত বুদ্ধি ও দৃষ্টি, স্বজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি প্রথমে বিশ্বাসের জন্ম দেয়।... যুক্তিকে সৃজনশক্তি না বলে সমন্বয়সাধক শক্তি বলে অভিহিত করলেই তা যথাযথ হবে। তাই অতীন্দ্রিয়বাদীমাত্রেই যে যুক্তিহীন হবেন তার কোনও মানে নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সব কিছুরই নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন সব কিছুর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো বিখ্যাত যুক্তিবাদী নৈয়ায়িকও বলেন, ''কোনও কোনও ঘটনাকে যদি সংজ্ঞাতীত বলে স্বীকার না করি তবে আমরা গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘুরপাক খাব।'' অন্যত্র তিনি বলেছেন, ''কিছু শব্দকে সঠিক সংজ্ঞা ছাড়াই স্বীকার করে নিতে হবে।'' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর... বাক্যমনের অতীত।'' তাঁর উপদেশাবলির অন্তর্নিহিত দর্শনকে উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের 'অনির্বচনীয়ত্ব' তত্ত্ব—যা বলে উচ্চতম পরম সত্য অনির্বচনীয়, তাকে বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবনা সম্বন্ধে বিংশ শতকের খ্যাতনামা ভারতীয় দার্শনিক স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের একটি মন্তব্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে সমসাময়িক কালের সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণন, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট দার্শনিক শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন উপস্থাপন করতে আগ্রহী হননি, যদিও আজকাল ভারতবর্ষে এবং বিদেশে তাঁর দর্শন অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন :

''অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি সকল শর্ত ও সকল রীতিনীতিকে অস্বীকার করেন, অথচ আপেক্ষিক বা শর্তাধীন অবস্থান থেকে তিনি জগন্মাতা কালীকে, তাঁর সকল রূপকে, তাঁর প্রতিচ্ছায়া বা আভাসকেও আরাধনা করেছেন। তিনি বহুর মধ্যে একের ও একের মধ্যে বহুর আরাধনা

করেছেন, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি কোনও বিরোধ দেখেননি। বরং তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এক পূর্ণতর সত্য। এইভাবেই তিনি সাকার ও নিরাকার উপাসনার ধারণার এক সমন্বয় সাধন করেছেন। দেবীপ্রতিমাকে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকাশরূপে দেখেছেন। বস্তু ও আত্মার মধ্যে তিনি কোনও পার্থক্য দেখেননি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অখণ্ড এবং আপেক্ষিক সত্য—এই দুইয়ের যেভাবে সমন্বয়সাধন করেছেন—সেই অবস্থান থেকেই আমি তাঁর অধ্যাত্মদর্শনের একটি পরিকাঠামো উপস্থাপন করব। শুরু করব প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

দক্ষিণেশ্বরে ত্রিশবছর বাসকালীন সময়টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর আরাধনা করতেন। কামারপুকুরের বাড়িতে তিনি গৃহদেবতার পুজো করেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে কিছুকাল তিনি প্রধান পুরোহিতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। যাঁরা তাঁকে সেসময় পুজো করতে দেখেছেন তাঁদের মনে হত যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেবল এক মূর্তিরূপে দেখছেন না, সেই মূর্তির মধ্যে তিনি জগজ্জননী কালীকে প্রত্যক্ষ করছেন। অনেকসময়ই মায়ের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, প্রশ্ন করতেন, তাঁকে সাজাতেন, নিজের হাতে খাওয়াতেন। লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে কখনও কখনও বিগ্রহের পায়ে ফুল নিবেদন করার পরিবর্তে তিনি নিজের মাথায় ফুল রাখতেন। এই অভিনব পদ্ধতিতে পুজো করার তাৎপর্য খুবই পরিষ্কার। তিনি উপলব্ধি করতেন জগজ্জননী কেবল প্রতিমাতে আবদ্ধ নন, তিনি আছেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই অন্তরে।

এখানেই দেখা যায় হিন্দুদের পূজাপদ্ধতির আপাত স্ববিরোধ। যাঁরা প্রতিমাপুজোর বিরোধী তাঁরাও কিন্তু উপাসনা শুরু করেন প্রতিমার উপাসনা করে। মানুষ পুজো আরম্ভ করে কোনও প্রতীকের উপাসনা দিয়ে, ক্রমে সেই প্রতীক প্রাণময় বলে প্রতিভাত হয় এবং অবশেষে প্রতিমাকে ছাপিয়ে সেই ঐশী চৈতন্য পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। আঠারোশো শতকের বাংলার শাক্ত কবি রামপ্রসাদ মন্দিরে কালীর উপাসনা করতেন, তা সত্ত্বেও উপলব্ধি করতেন যে মা কেবলমাত্র বিগ্রহের মধ্যে আবদ্ধ নন, তিনি বিরাজ করেন তাঁর হৃদয়ে। একটি গানে রামপ্রসাদ লিখেছেন : ''ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি,/ কাজ কি রে তোর সে-গঠনে।/ তুমি মনোময় প্রতিমা করি,/ বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥/ আলো চাল আর পাকা কলা,/ কাজ কি রে তোর আয়োজনে।/ তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে,/ তৃপ্ত কর আপন মনে॥"

যাঁরা বিগ্রহকে আচারবিধি অনুসারে পুজো করেন তাঁরাও মনে মনে জানেন যে এসব উপচার আত্মার ভাষামাত্র, কিন্তু আত্মা নিশ্চিত জানে তাকে এসব বিধির উর্ধ্বে উত্তরণ করতে হবে। ঢাক বা করতালের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে তাঁরা শোনেন আত্মার অন্তরের সংগীত।

মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে প্রতিমা-পূজার এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। একেশ্বরবাদে যাঁদের অটল বিশ্বাস তাঁরাও সিনাগগ্, গির্জা বা মসজিদকে ঈশ্বরের আবাস বলেই মনে করেন। হিন্দুদের প্রতিমাপূজা বিষয়ে এক খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ তাঁর 'The Development of Hindu Iconography' গ্রন্থে হিন্দুদের মূর্তিপূজার বিষয়ে একটি অতি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন : ''ধ্যানযোগের অনেক গুরুই মনে করেন, পরিপূর্ণ মোক্ষলাভ ও ঈশ্বরের সঙ্গে আনন্দময় সাযুজ্যের অনুভূতিলাভের জন্য মূর্তিপূজার প্রয়োজন আছে।" যদিও একথা বলা যায় না যে মূর্তিপূজক মাত্রেই আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বা আত্মার উত্তরণে সক্ষম। তবে আমাদের সকলেরই বোঝা উচিত যে সত্যিকারের ভক্ত প্রথম অবস্থায় বিগ্রহের সামনে বসেই আরাধনা করেন। ক্রমে তিনি

উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নীত হন। দেববিগ্রহ আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, সে-কারণেই আধ্যাত্মিক জীবন থেকে তাকে বাদ দেওয়া যায় না। জীবন থেকে যেমন কাব্যকে বাদ দেওয়া যায় না, তেমনই ধর্মাচরণ থেকে প্রতিমাকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে যা ছাড়তে হবে তা হল অন্ধবিশ্বাসে নিষ্প্রাণ প্রতিমার পুজো। আমার বিশ্বাস একজন অতি সাধারণ হিন্দুও প্রতিমাকে নিষ্প্রাণ বলে মনে করেন না। আমি লক্ষ করেছি, একজন হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমেই বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে স্পষ্টতই নিজের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেন। আমরা যে প্রতিমাকে অবলম্বন করে অতীন্দ্রিয়লোকে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম তার আর একটি উদাহরণ হল পুজোর তিন-চারদিন পরে মৃন্ময়ী প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়ার প্রথা। বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করে আমরা দুর্গামূর্তি নির্মাণ করি, নানাভাবে মূর্তি সাজাই। তাঁর সামনে ধূপ জ্বালি, দিনে দুবার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করি, তারপর চতুর্থ দিন জলে প্রতিমা বিসর্জন দিই। আমাদের প্রতিমাপূজার এটাই রহস্য।

এই আপাত স্ববিরোধিতা কিন্তু ঋগ্‌বেদের মতোই প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে প্রার্থনার মাধ্যমে বহু দেবদেবীর আরাধনার প্রথা উল্লিখিত। বৈদিকযুগে কোনও মূর্তি বা দেবালয় ছিল না। যা ছিল তা বাচিক প্রতিমা অর্থাৎ চিত্রোপম ভাষায় দেবতার বর্ণনা। তথাপি বৈদিক ঋষিরা এই পূজার পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁদের মনে সংশয়াকীর্ণ প্রশ্ন উঠেছিল 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' (কোন দেবতার প্রতি আমরা নৈবেদ্য নিবেদন করব)? ঋগ্‌বেদ এর উত্তরে বলেন, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (সত্য এক, জ্ঞানীরা তাঁকে বহু নামে অভিহিত করেন)। এই উক্তি ঋগ্‌বেদের বহুদেববাদের ধারণা থেকে একেশ্বরবাদে উপনীত হওয়ার বিবর্তনের ধারাকে চিহ্নিত করে।

ম্যাক্সমুলার তাঁর 'Six Systems of Indian Philosophy' গ্রন্থে বেদের একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে বলেন, যে-যুগেই ঋগ্‌বেদ সংহিতা সম্পূর্ণ হয়ে থাকুক না কেন, তার আগেই এই প্রত্যয় জন্মেছিল যে পরমপুরুষ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি নারী বা পুরুষ নন, তাঁর অবস্থান সকল অবস্থা, সকল ব্যক্তি-সীমাবদ্ধতা ও মনুষ্যপ্রকৃতির বহু ঊর্ধ্বে।

ঋগ্‌বেদ যেমন পরবর্তী যুগের একেশ্বরবাদের সূচক, তেমনই বৈদিক অদ্বৈতবাদেরও পূর্বসূরি। ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে ড. গ্রিসউড অদ্বৈতবাদের আভাস আবিষ্কার করেছেন, ম্যাকডোনেল হিন্দু-একেশ্বরবাদী মতবাদ দেখতে পেয়েছেন। তাঁর 'Vedic Reader for Students' গ্রন্থে তিনি বলেছেন, ভারতের 'সর্বেশ্বরবাদ' মতের সূচনা করে পুরুষসূক্ত। এটিই বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের অঙ্কুর। গ্রিসউড তাঁর 'The Religion of Rigveda' গ্রন্থে লেখেন, পরবর্তী কালের হিন্দুধর্মে অদ্বৈতবাদের সর্বব্যাপী পুরুষ ও বহুদেববাদের ধারণা একইসঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। সব সমস্যার সমাধান করা যায় একটি ধারণা থেকে—তা হল, সমগ্র প্রকৃতি এক প্রাণময় চেতনসত্তার দেহ, যাঁকে পুরুষ বা 'আত্মা' বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির এটি একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। উপনিষদ ও পরবর্তী বেদান্তদর্শনে যে-মহান অদ্বৈত ধারণা তার সূচনা এখানেই।

যখন মন্দিরে আমরা দেবতাকে প্রণাম করি অথচ একইসঙ্গে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এক অদ্বিতীয় সত্যে বিশ্বাস করি, তখনই হিন্দুধর্মের অদ্বৈতবাদ ও বহুদেববাদের সহাবস্থান আমরা ধারণা করতে পারি। আমাদের ধর্মভাবনার নির্যাস হল বহুর মাঝে একের অবস্থান।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভবতারিণীর বিগ্রহের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে বিগ্রহের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বের সকল স্থানে মা-কে আবিষ্কার করলেন। *(ক্রমশ)*